Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501068

OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75

SJIF Impact Factor 3.481

The influence of fiction on Bengali cinema: The transition from literature to screen
বাংলা চলচ্চিত্রে কথাসাহিত্যের প্রভাব: সাহিত্য থেকে পর্দার রূপান্তর

Purabi Howlader
Researcher
Bengali Department
Kalyani University

Received on: 29th Mach 2026
Accepted on: 14th April 2026

Abstract:
After creating millions of creatures in His universe, the Creator of the Universe sent His last and greatest creation, human beings, to earth. When man was born, he opened his eyes and saw the sky full of sun, stars, and the world full of life. Seeing this, wonder awoke in the minds of men. At the same time, inspiration awoke. From this inspiration of men, philosophy, science, and art were born. This is the art assembly created by men, here cinema came at the end of all. The narrative of the novel, the conflict of drama, the movement and conflict, dialogue, the beauty of poetry, the harmony of music, the colour of painting, the steps of dance, the posture of sculpture, combined with the combination of cinema as a distinct artistic entity. The relationship between literature and cinema is very close and intense. Both literature and cinema are narrative works. The picture that the painter creates with the brush is expressed in literature through literary language, that colourful image of the picture is expressed in literature and the filmmaker unfolds it on the screen with moving images. Bengali cinema has been nurtured and developed in the lap of Bengali language literature from its early days to this day.

Key Words:
Tilottama, Greatvibration, Canvas, Prehistoric, Amusing

মূল প্রবন্ধ

বিশ্ব-বিধাতা তাঁর সৃষ্টিশৃঙ্খলায় লক্ষ লক্ষ কোটি প্রাণী সৃষ্টি করবার পর পৃথিবীতে পাঠালেন তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষকে। মানুষ যখন জন্মাল, চোখ মেলে তাকাল, সে তখন দেখল আকাশ ভরা সূর্য তারা বিশ্ব ভরা প্রাণ। এই দেখে মানুষের মনে জাগল বিস্ময়। কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা। একই সঙ্গে জাগল অপরূপ এই জগৎ দেখে অনুরূপ জগৎ সৃষ্টির প্রেরণা। মানুষের এই প্রেরণা থেকে জন্ম নিল দর্শন, বিজ্ঞান এবং শিল্পকলা। মানুষ ও সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি ক্ষমতার অংশীদার হয়ে উঠল। বিশ্ব-বিধাতা যেন তাঁর শেষ সৃষ্টি মানুষের ওপর নতুন সৃষ্টি কার্যের ভার দিয়ে অবসর নিলেন। সেই থেকে চলেছে মানুষের রচনা কার্য। জল থেকে উদ্ভূত মহাস্পন্দন থেকে মানুষ শিখল সুর, আকাশের গায়ে এবং প্রকৃতির ঋতু পরিবর্তনের মধ্যে অহরহ যে খেলা চলছে তার থেকে শিখল চিত্রকলা, ঋতুচক্রের আবর্তে বিশ্বে প্রতিদিন যে সৌন্দর্য্য বিচ্ছুরিত হচ্ছে তা দেখে মানুষের মনে যে আবেগ এল নৃত্যের ভঙ্গিমায় সারা দেহে এই আনন্দ সে

© Santiniketan Sahityapath

ফুটিয়ে তুলল। এক কথায় এই রহস্যময় জগৎ মানুষের মনে নানা ভাব তরঙ্গের সৃষ্টি করল যাকে প্রকাশ করাবার জন্য তাকে মাধ্যম হিসাবে নিতে হলো নৃত্য, সংগীত, চিত্রকলা, কাব্য সাহিত্য ইত্যাদিকে। এই সমস্ত চিত্রকলা মানুষ সৃষ্টি করেছিল নিছক আনন্দ দেবার প্রয়োজনে।

মানুষের সৃষ্ট এই যে শিল্প সভা, এখানে চলচ্চিত্র এলো সবার শেষে। চলচ্চিত্রের আবির্ভাব কাল উনিশ শতকের শেষ আর বিশ শতকের শুরু। পৃথিবীর প্রাচীন শিল্পগুলির কাছ থেকে তিলে তিলে সব উপাদান সংগ্রহ করে চলচ্চিত্র এলো সবার শেষে। উপন্যাসের বর্ণনা, নাটকের দ্বন্দ, ঘাত-প্রতিঘাত, সংলাপ, কাব্যের সুষমা, সঙ্গী-বৃত্তের লয়, চিত্রকলার রঙের খেলা, নৃত্যের পদক্ষেপ, ভাস্কর্যের ভঙ্গিমা মিলে একটি স্বতন্ত্র শিল্প সত্তা হিসাবে চলচ্চিত্র আত্মপ্রকাশ করেছে। এক কথায় চলচ্চিত্র হল শিল্পের তিলোত্তমা। এই চলচ্চিত্রের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ট ও নিবিড়। উভয়ের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বিশিষ্ট চলচ্চিত্র সমালোচক রিচার্ডসন লিখেছেন —

> "The connection that exist between literature and film.
> are worth concentrating upon first and most simply
> because literature and film are near two forms of artistic
> expression appear to be increasingly dominant in
> the formation of aesthetic responses."[১]

সাহিত্য ও চলচ্চিত্র উভয়ই Narrativeধর্মী রচনা। তবে এই Narrationএর প্রকৃতি ভিন্ন। কবি-সাহিত্যিক ভাষা দিয়ে যে কোন বস্তুর বর্ণনা করতে পারেন, যে-কোনো চিত্র আঁকতে পারেন। তুলি দ্বারা চিত্রকর যে চিত্র সৃষ্টি করেন সাহিত্যিক ভাষার দ্বারা চিত্রের সেই বর্ণাঢ্য মূর্তিকে সাহিত্যে প্রকাশ করেন এবং চলচ্চিত্রকার চলমান চিত্র দিয়ে তা পর্দায় পরিস্ফুটিত করেন। আর শব্দ যন্ত্রের মাধ্যমে ধ্বনিত হয় সংগীতের সুর। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মধ্যে গল্প ও উপন্যাসের সঙ্গেই চলচ্চিত্রের সম্পর্ক বেশি। কথাসাহিত্যে ও চলচ্চিত্র যেমন চিত্রধর্মী ও সংগীত ধর্মী তেমনি কাহিনিধর্মীও। ঔপন্যাসিক যেমন তাঁর উপন্যাসে, ছোটোগল্পকার যেমন তাঁর ছোটগল্পে একটি কাহিনি বিবৃত করেন, চলচ্চিত্রকার ও তেমনি তাঁর চিত্রনাট্য একটি কাহিনি বিবৃত করেন। এই কাহিনি বা Plot বা থিম বা ভাববস্তুর জন্য চলচ্চিত্রকে বারংবার কথাসাহিত্যের কাছে হাত পাততে হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা সাহিত্যকে যেমন বঙ্কিম-যুগ বলা হয়, তেমনি বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ হলো রবীন্দ্র-যুগ। আর বাংলা চলচ্চিত্র বিকশিত হয়েছে বাংলা সাহিত্যের এই রবীন্দ্র-যুগে। এই যুগ বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ। বাংলা কথাসাহিত্যের আসর তখন জমজমাট। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'চোখের বালি', 'গোরা', 'যোগাযোগ', 'শেষের কবিতা', 'চতুরঙ্গ' আর গল্পগুচ্ছের বিচিত্র ধরণের গল্পের ঐশ্বর্য নিয়ে বিরাজ করছেন সঙ্গে আছেন শরৎচন্দ্র, প্রভাতকুমার, প্রমথ চৌধুরীর মতো উজ্জ্বল নক্ষত্রগণ। আরো আছেন 'ভারতী', 'মানসী', 'সবুজপত্র', 'বিচিত্রা', 'কল্লোল', 'কালিকলম', 'শনিবারের চিঠি'র নবীন প্রবীণ কথাশিল্পীগণ।

বাস্তব বাংলাদেশের পল্লীজীবন ও নগর জীবনকে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্ব সংঘাতহীন বাঙালি জীবনের কাহিনি রচনা করলেন প্রভাতকুমার মখোপাধ্যায়। প্রভাতকুমারের সঙ্গে সঙ্গেই শরৎচন্দ্র এলেন সংসারে যারা শুধু পেল না কিছুই যারা দুর্বল তাদের কথা বলতে। তিনি আমাদের সামনে হাজির করলেন 'কাশীনাথ', 'দেবদাস', 'বিপ্রদাস', 'পণ্ডিতমশাই', 'শ্রীকান্ত', 'বড়দিদি', 'মেজদিদি,' 'বিজয়া', 'বিরাজ বৌ', 'আর 'বিন্দুর ছেলে'কে। শোনালেন এই সমস্ত বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারের নর-নারীদের সুখ-দুখঃ, ব্যথা-বেদনা, হাসি-কান্না, দ্বন্দ্ব-কলহ, লোভ, হিংসা, আত্মত্যাগ ও স্বার্থপরতার কথা। চলচ্চিত্রে দর্শক যে ধরণের কাহিনি পছন্দ করে শরৎচন্দ্র যেন কোনো যাদুমন্ত্র বলে সেই কায়দাটা জেনে ফেলেছিলেন। ১৯৩৫ সালে প্রমথেশ বড়ুয়ার 'দেবদাস' সমগ্র ভারতীয় চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের সূচনা করল। এইভাবে বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্র যে জগৎ সৃষ্টি করে পাঠকের মন জয় করেছিলেন, সেই জগতের চতুঃসীমার মধ্যেই বাংলা চলচ্চিত্রের কাহিনির মূল সুর বিধৃত থেকেছে।

© Santiniketan Sahityapath

১৯১৫ সাল থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'ভারতী' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে একটি লেখক গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। এদের মধ্যে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'শেফালী' (১৯১০), 'নির্ণয়' (১৯১১), 'মাতৃঋণ', 'বন্দী', 'অসাধারণ', 'চারু বন্দোপাধ্যায়ের 'বরণডালা' (১৯৯০), 'পুষ্পপাত্র' (১৯১০), 'সওগাত' (১৯১১), 'ধূপছায়া' (১৯১২), 'আগুনের ফুলকি' (১২২১), 'পরগাছা' (১৯১৭), 'দুই তারা' (১৯১৮), হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'পসরা' (১৩২২), 'মধুপর্ণা', রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়ের 'ময়ূর', 'ধর্মপাল', 'শশাঙ্ক', প্রকৃতি সে যুগে পাঠকদের মন জয় করেছিল। এই সমস্ত ঔপন্যাসিকদের বেশ কিছু কাহিনি চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে।

ভারতী-মানসী-বিচিত্র-সবুজপত্র গোষ্ঠীর লেখকরা যখন বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎ-সরণীতে বিচরণ করছেন, সেই সময় কল্লোল-কালিকলম-প্রগতি গোষ্ঠীর একদল তরুণ নবীন লেখক একটু উলটো পথে হাঁটলেন। তাঁরা কথাসাহিত্যের মোড় ফেরাতে চাইলেন। দেশে এ সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে দারুণ অর্থনৈতিক মন্দা, ফলে বেকার সমস্যা, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন (১৯২০) জাতীয় কংগ্রেসের দোলাচল মনোবৃত্তির ফলে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে যুবশক্তির উত্থান। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দ্বারা হিন্দু মুসলমানের বিভেদ সৃষ্টি। এই রকম পরিস্থিতিতে একদল নতুন নবীন কথাসাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটল যাদের মুখপত্র হলো কল্লোল-কালিকলম আর প্রগতি পত্রিকা। এই গোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে অন্যতম হলেন দীনেশরঞ্জন দাশ, গোকুল নাগ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, কাজী নজরুল ইসলাম, জগদীশ গুপ্ত, মনীশ ঘটক, প্রবোধকুমার সান্যাল, অন্নদাশঙ্কর রায় প্রমুখ।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় কয়লাকুটির শ্রমিক-সাঁওতালের ম্লান বিবর্ণ-জীবন কথাকে আশ্চর্য কুশলতার সঙ্গে ফোটালেন। তাঁর 'নারীমেধ' (১৩৩৫), 'বধূবরণ' প্রভৃতির মধ্যে প্রকাশিত হলো নির্মম বাস্তব চিত্র। জগদীশ গুপ্তের বাস্তবতাকে অবলম্বন করে লেখা 'বিনোদিনী' বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনা। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পাঁক' (১৯২৬) এবং 'মিছিল' (১৯৩৯) আধুনিক উপন্যাসের প্রথম নিদর্শন হিসেবে গৃহীত হলো। বুদ্ধদেব বসুর কাব্যধর্মী রোমান্টিক কাহিনি 'যেদিন ফুটল কমল' (১৩৪০), 'একদা তুমি প্রিয়ে' (১৩৪১), 'তিথিডোর' (১৩৪৯) প্রভৃতি নবীনদের প্রশংসা পেল। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বিচিত্র বিষয়বস্তু অবলম্বনে ভাষা-ভঙ্গিমার বৈচিত্র্যে ও রোমান্টিক রীতিতে এবং দেহ সম্পর্ক বর্ণনা করে তরুণ সমাজে প্রতিষ্ঠা পেলেন। এই সময় অন্নদাশঙ্কর রায় য়ুরোপীয় উপন্যাসের অনুকরণে সমাজ নীতি, দার্শনিক তত্ত্বকথা এবং মানসিক জটিলতা নিয়ে 'যার যেথা দেশ', (১৯৩২), 'অজ্ঞাত বাস' 'কঙ্কাবতী' (১৯৩৪), 'আগুন নিয়ে খেলা', 'পুতুল নিয়ে খেলা' লিখলেন। কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে দীনেশরঞ্জন দাশ, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, কাজী নজরুল ইসলাম, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ঠ ছিলেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় দক্ষতার সঙ্গে অনেক চলচ্চিত্রের জগতেও বিশেষ ভাবে স্মরণীয়।

এই সকল কথা সাহিত্যিক ছাড়া যাঁরা সমগ্র বাঙালি মনকে শরৎচন্দ্রের মতোই নাড়া দিয়েছিলেন তাঁরা হলেন — বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভূতিভূষণ 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত'তে সমস্যা জর্জরিত পল্লীজীবনের বুকে পল্লীস্বর্গ রচনা করলেন। তারপর ক্রমে ক্রমে তাঁর 'দৃষ্টি প্রদীপ' (১৩৪২), 'আরণ্যক' (১৩৪৫), 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' (১৩৩৭) 'দেবযান' (১৩৫১), 'ইছামতী' (১৩৫৬) প্রভৃতি উপন্যাস এবং 'মেঘমল্লার' (১৩৩৮), মৌরীফুল' (১৩৩৯), 'যাত্রাবদল' (১৩৪১) প্রভৃতি গল্পগ্রন্থে পাঠকদের এক ভিন্ন জগতে নিয়ে গেলেন। বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণ একক ও অনন্য। বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' নিয়ে ১৯৫৬ সালে সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনায় বাংলা চলচ্চিত্রের এক নতুন যুগের সূচনা হলো।

একদিকে বিভূতিভূষণ যেমন পল্লীজীবনের বুকে পল্লীর স্বর্গ আঁকলেন — অন্যদিকে তেমনি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'ধাত্রীদেবতা', 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'কালিন্দী', 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র বিশাল ক্যানভাসে পল্লীজীবনের পূর্ণচিত্র অঙ্কিত করলেন — যার অভাব ছিল আমাদের বাংলা সাহিত্যে এমনকি শরৎচন্দ্রেও। এই সমস্ত উপন্যাসগুলিতে আমরা দেখতে পেলাম আমাদের বহু পুরাতন জমিদার তন্ত্রের সঙ্গে ব্যবসাতন্ত্রের সংঘাত। ফলে জমিদারের পতন, কৃষিজীবন বনাম যন্ত্রজীবনের সংঘর্ষ ও

© Santiniketan Sahityapath

যন্ত্রণা। তারাশঙ্কর এই সমাজ বিপর্যয়ের কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার রাঢ় অঞ্চলের বেদে-বেদেনী, আউল-বাউল, যাদুকর, কবিয়াল, বৈষ্ণব, কাহার, বাউড়ী, ডোম ও সদগোপ চাষীদের এক নিখুঁত চিত্র তুলে ধরেছেন তাঁর 'কবি', 'রাইকমল', 'নাগিনীকন্যার কাহিনি', 'সন্দীপন পাঠশালা', 'অভিযান', 'নীলকণ্ঠ', 'চৈতালীঘূর্ণি' প্রস্তুতি উপন্যাসে ও বহু ছোটোগল্পে। এই চিত্রগুলি বাংলার চলচ্চিত্রে প্রচুর রসদ জুগিয়েছে। এককথায় বলা যায় তারাশঙ্কর যেন বিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলাদেশের সমাজের এক মহাভারত রচনা করেছেন।

পশ্চিমবাংলার রাঢ় অঞ্চলের মানুষদের সম্বন্ধে তারাশঙ্কর যেমন অভিজ্ঞ ছিলেন, তেমনি পদ্মাবিধৌত পূর্ব বাংলার জীবনচিত্রকে অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় একদিকে যেমন পূর্ববাংলার বিশাল নদী প্রান্তরের সাধারণ মানুষের বাস্তব জীবনের ছবি এঁকেছেন। অন্যদিকে তেমনি মানুষের আদিম পিপাসার এক বাস্তব মূর্তি এঁকে আদিম পৃথিবীর অন্ধকারে ফিরে গেছেন। এ ব্যাপারে ফ্রয়েডের মনোবিকলন তত্ত্ব তাঁর চিন্তাধারায় বিশেষ ভাবে ক্রিয়া করেছিল। তাঁর 'দিবারাত্রির কাব্য' (১৯৩৫), 'পুতুল নাচের ইতিকথা' (১৯৩৬), 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬), 'শহরতলী' (১৯৪০) প্রভৃতি উপন্যাস এবং 'অতসীমামী' (১৯৩৫), 'প্রাগৈতিহাসিক' (১৩৪৫) প্রভৃতি ছোটগল্প নিঃসন্দেহে বাংলা কথাসাহিত্যে নতুন স্বাদ এনেছে।

এই সময় বেশকিছু কথাসাহিত্যিক তাঁদের কথা শিল্পের মাধ্যমে বাঙালি পাঠককে বিশুদ্ধ হাস্যরস পরিবেশন করেছেন যাদের মধ্যে রয়েছেন — কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু। কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কোষ্ঠীর ফলাফল' (১৯২৯), 'ভাদুড়ী মশাই' (১৯৩২), 'আইহ্যাজ' (১৯৩৫) পাঠক মহলে প্রচুর খ্যাতিলাভ করেছিল। হিউমার রসের কাহিনি রচনার ক্ষেত্রে বিভূতিভূষণ একক ও অনন্য। বেদনা মিশ্রিত বিশুদ্ধ হাস্যরসের গল্পকাহিনি বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ছাড়া বাংলা সাহিত্যে আজ পর্যন্ত কেউ রচনা করতে পারেন নি বলা চলে। হিউমার রসের লেখক হিসাবে তিনি বিশ্বের যে-কোনো শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক লেখকের সমতুল্য। 'রানুর প্রথম ভাগ', 'দ্বিতীয় ভাগ', 'তৃতীয় ভাগ', 'রাণুর কথামালা', 'বরযাত্রী', 'নীলাঙ্গুরীয়' প্রভৃতি গল্প ও উপন্যাসে তিনি বাঙালি পাঠকের জন্য বিশুদ্ধ হাসির খোরাক দিয়েছেন। বিভূতিভূষণ যেমন হিউমার রসের অধিপতি পরশুরাম তেমনি ব্যঙ্গ-কৌতুকের। এ সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় সমালোচক বলেছেন — "চরিত্রের আচার ব্যবহার, সংলাপ, পরিবেশ প্রভৃতির কৌতুককর সন্নিবেশে তাঁর গল্পগুলি শুধু রসিকতা প্রিয় পাঠকের সাময়িক চিত্ত বিনোদন করেই মুছে যায়নি। অসাধারণ অভিজ্ঞতা, কৌতুকরস সৃষ্টির দুর্লভ শক্তি, বুদ্ধির উজ্জ্বলতা কোথাও কোথাও সামান্য রঙ্গ রস পরিবেশনে তাঁর 'গড্ডালিকা' (১৯২৪), 'কাজলী' (১৯২৭), 'হনুমানের স্বপ্ন' (১৯৩৭) এবং পরবর্তীকালে গল্প সংগ্রহগুলি রুচিবান পাঠক সমাজে এখনও অত্যন্ত আকর্ষণের বস্তু হয়ে আছে। হাস্য কৌতুকের ক্লাসিক পর্যায়ে তুলে ধরার সমস্ত গৌরব তাঁর প্রাপ্য।"[২]

ওই সময়ে কয়েকজন মহিলা ঔপন্যাসিকও বাঙালি সমাজে খ্যাতিলাভ করেছিলেন এবং এঁদের রচিত গল্প উপন্যাসও চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়ে দর্শকদের আনন্দ দিয়েছিল। এদের মধ্যে অনুরূপা দেবীর 'পোষ্যপুত্র' (১৯১৯), 'জ্যোতিহারা', (১৯১৫) 'মন্ত্রশক্তি' (১৯১৫), 'মহানিশা' (১৯১৯), 'মা' (১৯২০) বিখ্যাত। নিরুপমাদেবীর 'দিদি' (১৯১৫), 'বিধিলিপি' (১৯১০), 'শ্যামলী' (১৯১৮) প্রভৃতি উপন্যাসগুলি আবেগবছল এবং এই কারণেই এগুলি বাঙালি পাঠকের কাছে খুব সমাদর লাভ করেছিল। এই প্রসঙ্গে প্রভাবতী দেবী সরস্বতী এবং আশাপূর্ণা দেবীর নামও উল্লেখ্য। আশাপূর্ণা দেবী কাহিনি গ্রহণ, চরিত্রসৃষ্টি এবং দেশকালের ছবি ফোটাতে বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। এঁদের বেশকিছু কাহিনি চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে।

বাংলা কথাসাহিত্যের এই বিশাল উর্বর শস্যক্ষেত্র থেকে বাংলা চলচ্চিত্র তার প্রয়োজন মতো ফসল সংগ্রহ করে বিকশিত হয়ে উঠেছে। এই সাহিত্যাশ্রয় বাংলা চলচ্চিত্রের পক্ষে একদিকে ভাল হয়েছে আবার কিছুটা মন্দও হয়েছে। কথাসাহিত্যের সমৃদ্ধি বাঙালি শিক্ষিত সমাজের সম্পদ। সেই সম্পদ নির্ভর করে ও তার থেকে কাহিনি গ্রহণ করার ফলে বাংলা চলচ্চিত্রের প্রধান দর্শক গোষ্ঠী হয়েছে বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজ। আর এই মধ্যবিত্ত মানসিকতা বাংলা চলচ্চিত্রের ভিত্তিকে দৃঢ় করেছে এবং এর ফলে পরবর্তীকালে একটা বড়ো বিপদ থেকে বাংলা চলচ্চিত্র রক্ষা পেয়েছে। আবার একথাও স্বীকার করতে হবে বাংলা সাহিত্য যেমন চলচ্চিত্রকে কাহিনি দিয়েছে, তেমনি চলচ্চিত্রও বাংলা কথাসাহিত্যকে দিয়েছে তার ব্যাপক প্রচার। চলচ্চিত্রে রূপান্তরের মাধ্যমে কথাসাহিত্যিকগণের রচনা গ্রামে গঞ্জে

অশিক্ষিত জনের মধ্যে পৌঁছে গেছে। অক্ষম ও সক্ষম পরিচালকদের সৃষ্টির মারফৎ বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ কখনো বিকৃত রূপে আবার কখনো অবিকৃত রূপে দর্শকের কাছে হাজির হয়েছেন।

পরিশেষে বলা যায় বাংলা চলচ্চিত্র ও বাংলা কথাসাহিত্য গোড়ার থেকে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে একটা নিবিড় সম্পর্ক বজায় রেখে এগিয়ে এসেছে। বাংলা চলচ্চিত্র তার আদি পর্ব থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বাংলা কথাসাহিত্যের কোলে লালিত পালিত বর্ধিত।

তথসূত্র:

১। Robert D. Richardson, 'Literature and Film', Vol-155, Indiana University Press, 1969, p. 12
২। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত', মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ৫৫৯

সহায়ক গ্রন্থ:

১। কালীশ মুখোপাধ্যায়, 'বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের ইতিহাস', রূপ মঞ্চ প্রকাশিকা, ১৯৬৩
২। প্রণবকুমার বিশ্বাস, 'বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাস', সমকাল প্রকাশনী, ১৯৭৭
৩। ধীরেশ ঘোষ, 'চলচ্চিত্র নির্মাণ ও পরিচালনা', বাণীশিল্প, কলকাতা, ২০০৮
৪। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্তি', মডার্নবুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৫
৫। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর', দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১২
৬। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'বাংলা গল্প বিচিত্রা', বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৫৮
৭। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর', সাহিত্যশ্রী, কলকাতা, ১৯৬১

Prantik Gabeshana Patrika